সত্যের সন্ধানে

সমীর চক্রবর্তী

পুনশ্চ

প্রাক্-কথন

আকস্মিক একটি মৃত্যুর ঘটনাকে ভিত্তি করে কাহিনিটির বিস্তার, যেটি ঘটেছিল পুরীতে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। তখন পুরীর যে নিসর্গ চিত্র ছিল বলা বাহুল্য, এখন আর তা নেই। যেমন পুরীর সমুদ্রের ধারে যে গভীর ঝাউবনটি ফিরে ফিরে কাহিনিতে এসে পড়েছে বন্ধুবান্ধবদের মুখে শুনেছি সেটি এখন নিরুদ্দেশ। পাঠকের মনে এ বিষয়ে একটা খটকা লাগতে পারে-এই ভেবে বিষয়টির উল্লেখ করলাম। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে মৃত্যুর ঘটনা ব্যতিরেকে কাহিনিটি সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক, তবু যদি কেউ এই কাহিনির সঙ্গে কারুর কোনো মিল খুঁজে পান তবে সেটা নিতান্তই সমপাতনিক।

কাহিনিটিকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করার বিশেষ কোনো আগ্রহ আমার ছিল না। কিন্তু আমার অগ্রজ শ্রী শিশির চক্রবর্তী (যিনি নিজেও একজন লেখক) কাহিনিটি পড়ে আমাকে কিছু কিছু জায়গায় সংশোধন ও সেই সঙ্গে আরও কিছু বিষয়ে তাঁর মতামত দেন ও কাহিনিটি প্রকাশের জন্য বলেন। এছাড়া আমার পুত্র শ্রী শোভনলাল, যার লেখালেখির অভ্যেস আছে; সেও আমাকে লেখাটি পড়ে ও বই আকারে প্রকাশ করার কথা বলে। কিন্তু এ পর্যন্তই। পরে আমার কয়েকজন ছাত্র লেখাটি পড়ে ও বই আকারে সেটি ছাপার জন্য একপ্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আমাকে 'পুনশ্চ' নামক প্রকাশনার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সন্দীপ নায়েকের কাছে নিয়ে যায়, একরকম জোর করে ও গাঁটের

পয়সা খরচা করে নতুন কোনো লেখকের বই ছাপতে কোনো প্রকাশকই তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না, তবে করবেনই বা কেন? এখন বই পড়ার অভ্যেস বেশিরভাগ বাঙালিরই নেই বললেই চলে। কোন্ প্রকাশক ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে চাইবে? আমার সৌভাগ্য শ্রী নায়েক লেখাটি যত্ন করে পড়েন এবং অবশেষে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। লেখার কিঞ্চিত প্রশংসা করে লেখাটি ছাপাতে রাজি হন। তাঁকে আমার হার্দিক শুভেচ্ছা।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার অগ্রজকে ও আমার অগণিত ছাত্র-ছাত্রীদের ও আমার অনুজ প্রতিম, সোসাইটি ফর মডেল গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রের কর্ণধার শ্রী গণেশ চন্দ্র মোদককে, যাদের সাহায্য ছাড়া লেখাটি পুস্তক আকারে প্রকাশ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। লেখার গুণাগুণের বিচার অবশ্যই পাঠক সমাজের।

সমীর চক্রবর্তী

জানুয়ারি ২০১৫

হঠাৎই সোমশংকরের কাছে একটা ভ্রমণের সুযোগ এসে গেল। ওর তিনছাত্র, বাবা-মায়ের সঙ্গে পুজোর ছুটিতে পুরী যাচ্ছে। মারোয়ারি পরিবার। ওর কাছে প্রস্তাব- যাতায়াতের খরচ এবং পুরীতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ওঁরাই করবেন। শর্ত এই যে ছাত্রকে পড়ানোর কাজটা চালিয়ে যেতে হবে। প্রস্তাবটা লোভনীয়। আর যে দু-জায়গায় ও পড়ায়, সেখানে ফিস না নিলে এই সময় ছুটি পাওয়ার অসুবিধে নেই, আর তাছাড়া, পুজোর সময় কুড়ি-একুশদিন এমনিতেই ছুটি থাকে। প্রায় এক মাসের মতো মেসের মিলচার্জটা দিতে হবে না, অতএব ও রাজি হয়ে গেল।

নোপানিরা (যে পরিবারে ও পড়ায় তাদের পদবি) একটা পুরো বাড়ি ভাড়া নিয়েছে, কিন্তু সোমশংকর সেখানে থাকল না, ও কাছেই ইনটারন্যাশানাল ইউথ হোস্টেলে এ গিয়ে উঠল। হোটেলটা সমুদ্রের খুব কাছে। একটা সিঙ্গল বেডের ঘরও পেয়ে গেল। এখানে খাওয়ার খরচও বেশ কম, এতে দু-পক্ষেরই স্বস্তি। হোটেলটার ম্যানেজার বাঙালি, বদ্যিবাটির চাটুজ্যে। সবই বেশ পছন্দ মতো ক্লিক করে যাচ্ছে। একটু খেয়াল করে বুঝতে পারল হোটেলটার অধিকাংশ বোর্ডারই অল্প বয়সি এবং বিদেশি, পোশাক-আশাক দেখে বোঝা যায় জাত টুরিস্ট। ভ্রমনই যাদের নেশা, জার্মান ভাষায় যাকে বলে 'ভান্ডেরলুস্ট'। এটাও হোটেলটার আর একটা প্লাস পয়েন্ট। বেড়াতে আসা বাঙালিদের মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে এরা তুলকালাম করে না। যদিও পুরীতে সোমশংকর এই প্রথম এল এমন নয়, তবু মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে সময়টা কীভাবে কাটাবে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে বেড়িয়ে পড়ল। এ-দিকটায় লোকজন কম। একটু দূরে সাউথ ইস্টার্ন হোটেল। ছড়ানো ছিটানো কয়েকটা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। একটা বাড়ির নাম রিট্রিট, কেউ থাকে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আরও কয়েকটা পুরোনো বাড়ির একতলাটা বালিতে গিলেছে। সব জড়িয়ে কেমন একটা আর্কিওলজিকাল অ্যাসপেক্ট। একটু এগিয়েই সমুদ্র। ভোরের সূর্য তটভূমিকে একটা সোনালি রং মাখিয়ে দিয়েছে। ঢেউগুলো বেশ প্রবলভাবে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে, আর সাদা ফেনায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বালি। মনে পড়ে গেল প্রেমেন মিত্রর কবিতার একটা লাইন। "সাদাফেনা থেকে যেন শাঁখ মাজা ডানা মেলে আকাশের তল্লাস নিচ্ছে। কাছেই

কয়েকজন নুলিয়া (কেমন করে আর কেনই বা এদের নাম নুলিয়া হল কে জানে?), ওদের জিজ্ঞেস করে নিল এদিকটায় এখন হাঙরের উৎপাত হয়েছে কিনা। না নেই। সুইমিং ট্রাঙ্কটা পড়ে নিয়ে নেমে গেল সমুদ্রে। ঢেউয়ের পাহাড়গুলো ডিঙিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

হোটেলে ফিরে এসে আর একবার স্নান সেরে নিল। নোনা জলে গা চ্যাটচ্যাট করে। এক কাপ চা খেয়ে হোটেলটার পিছন দিকটায় এসে দেখতে পেল টেবিল টেনিস খেলছে একজন কিশোর আর একজন বিদেশি যুবক। ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে। এমন সময় আর একটি যুবক, সেও বিদেশি, ওই কিশোরের খেলোয়াড় সঙ্গীটিকে ডেকে নিয়ে গেল। ওদের বেড়িয়ে পড়ার সময় হয়ে গেছে। কিশোর ছেলেটি বাঙালি, তবে খুব ফরসা। ওকে জিজ্ঞেস করল টেবিল টেনিস খেলতে পারে কিনা। ব্যাট হাতে সোমশংকর খেলা শুরু করে দিল। কলেজে পড়ার সময় এই খেলাটায় বেশ হাত পাকিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে খেলা শেষ হল। সোমশংকর ইচ্ছে করেই হেরে গিয়েছে। হেরে গিয়েও কত আনন্দ।

—তোমার নাম কি?

—প্রদীপ সঈদ মুখার্জি

—কোথায় থাকো ?

—কাছেই রিট্রিট বলে একটা বাড়ি আছে সেখানে। কালকে আবার আমার সঙ্গে খেলবেন তো? আপনি খুব ভালো খেলেন।

—কালকে এই সময়ে যদি হোটেলে থাকি তাহলে খেলব।

ছেলেটি চলে যাবার পর সোমশংকর ভাবছে, বোধহয় ছেলেটির বাবা হিন্দু-ব্রাহ্মণ আর মা মুসলমান। ছেলের নামের মধ্যে দুজনেরই পরিচয়। এটাইতো হওয়া উচিত। মা হচ্ছে আসল পরিচয়।

সন্ধেবেলা ছাত্র পড়িয়ে ফেরার সময় দেখল সকালবেলার সেই দুই বিদেশি যুবক বিরাট একটা কলার কাঁদি নিয়ে হোটেলে ঢুকছে। রাতের খাবারটা ওতেই সারবে বোধ হয়? হোটেল খরচ কমবে। এভাবেই এরা চষে বেড়ায় সারা দুনিয়া।

—এই ভর দুপুরে কোথায় যাচ্ছেন?

—যাই একটু বেড়িয়ে আসি।

—এই দুপুরে হোটেলবাসীরা এয়ারকন্ডিশনার মেশিন চালিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আর আপনি চললেন ঘুরতে?

—কি করব বলুন দুপুরে যে ঘুম আসতে চায় না। কিন্তু আপনিও তো দেখছি খাতা খুলে বসে আছেন, আপনার ঘুমুতে ইচ্ছে করে না?

—কি কুক্ষণে যে বিয়ে করতে গিয়েছিলাম।

—দুঃখ করবেন না, ছুটিতে যখন বাড়ি যান তখন বউ ছেলেমেয়েদের দেখলে যে আনন্দ পান, সেটা কি বিয়ে না করলে পেতেন?

এইবার একটু হেসে ফেললেন ম্যানেজার বদ্যিবাটির চ্যাটার্জি

—কোথায় যাবেন কিছু ঠিক করেছেন?

—না,

—ওঃ যেদিকে দুচোখ যায়?

—শুধু চোখ কেন, ঠ্যাং দুটোর কথাও ভাবুন। আপন মনে চলতে চলতে যেখানে গিয়ে ঠ্যাকা যায় - বুঝলেন না, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন - "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ" আর আমার হচ্ছে এই পথ চলাতেই আনন্দ।

—বেশ আছেন, চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, আপন মনে ঘুরে বেড়ানো।

—আবার একটা ভুল করলেন।

—ভুল করলাম?

—হ্যাঁ, যখন কোনো কাজ থাকে না, চুপ করে বসে থাকেন তখন মাথায় কি কোনো চিন্তা বা ভাবনা থাকে না?

চ্যাটার্জিবাবু একটু ভেবে বললেন—তা কিছু একটাতো থাকেই।

—তার মানে হল আপনি চিন্তা করছেন বলে বেঁচে আছেন, আবার উলটো করে বলতে গেলে আপনি বেঁচে আছেন বলেই চিন্তা করতে পারছেন।

—আপনার চালচলন সাঁতারকাটা যেমন গোলমেলে, আপনার কথাবার্তাও তেমনি গোলমেলে। চিন্তা করছি বলে বেঁচে আছি আবার বেঁচে আছি বলে চিন্তা করছি।

—কোন্‌টা ঠিক ভাবুন, আচ্ছা করে ভাবুন, এই বার চলি, কেমন?

বাইরে বেশ গরম। সোমশংকর সোজা চলে এলেন সমুদ্রের পারে। একেবারে শুনশান বেলাভূমি, এদিকটায় সুখী মানুষের বাস। দূরে কয়েকজন জেলে কয়েকটা নৌকো ঠেলে ঠেলে জলের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে, মাছ ধরতে বেরুবে। এখন ভাটা। সমুদ্র অনেকখানি সরে গেছে। ওরা বোধহয় ভাটার সময় বেরোয়। সোমশংকর হাঁটতে শুরু করল। দূরে একটা ঝাউবন দেখা যাচ্ছে। সেই দিকে হাঁটা শুরু করল। বাঃ চমৎকার, জায়গা, বেশ ঠান্ডা। একটা পাখি শিস দিয়ে উঠল যেন নিঃস্তব্ধতাকে মেপে নিচ্ছে। ঝাউবনটা খুব ছোটো নয়, পেরিয়ে আসতে বেশ সময় লাগল। আরও কিছু দূর হেঁটে গিয়ে চোখে পড়ল কয়েকটা মাটির ঘর। পারের ঢালটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে ঠিক তার ওপরে। ওখানে কাদের বসতি? সোমশংকর যখন হাঁটতে

হাঁটতে বসতির খুব কাছে এসে পড়েছে সেইসময় লক্ষ করল কয়েকটি মাছ ধরার জাল রোদ্দুরে শুকোচ্ছে। আরও একটু গিয়ে চমকে উঠল। বসতি নয় বস্তি। শুকনো মাটির ওপর এদিকে ওদিকে শুয়ে আছে কিছু মানুষ, প্রায় মড়ার মতো। পরনে লজ্জা ঢাকবার মতো এক চিলতে কাপড়, পাগুলো ফোলা। বোধহয় দেশি মদের বলি। ঘরগুলোর দিক চোখ মেলতে বুঝতে পারল দরিদ্রতা কাকে বলে। বস্তির মধ্যে রাস্তা বলতে আলাদা কিছু নেই। ঘরগুলো এদিক ওদিক ছড়ানো। কলকাতার বস্তিগুলোর থেকে একটাই তফাত, কলকাতার বস্তিগুলো ক্লেদাক্ত ও নোংরা, এগুলো তুলনায় অনেক পরিষ্কার। আরও একটু এগিয়ে যেতে দেখতে পেল বেশ বড়ো একখণ্ড ফাঁকা উঠোন। চটের ওপর শুকোচ্ছে কাঁঠাল বিচি। অন্য একটা জায়গায় পাতলা করে কাটা আলুর মতো কি যেন। একটু কাছে যেতেই কাঁঠালোর গন্ধ এল নাকে। খেয়াল করে দেখল কাঁঠালের কোয়াগুলো খাওয়ার পর যে আঁশগুলো ফেলে দেওয়া হয় সেইগুলো শুকোচ্ছে রোদে। এগুলোও ওরা খায়। বস্তির ধার ঘেঁষে সারি সারি কাঁঠাল গাছ, ওদের স্টেবল ফুড তবে কাঁঠাল। এমন সময় কানে এল 'বাবু' 'বাবু' বলে কারা যেন ডাকছে। পেছন ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল কয়েকটা কিশোর। পরনে ইজের, খালি গা। ওর দিকে এগিয়ে এসে পরিষ্কার বাঙালায় বলল-বাবু, বাবা তোমায় ডাকে।

—বাবা ? কার বাবা ?

—আমাদের রামবাবা।

—কোথায় ?

—আসো মোদের সঙ্গে।

সোমশংকর ওদের পেছন পেছন চলছে আর দেখছে মাটির বারান্দায় শুকোচ্ছে ছেঁড়া ইজের থেকে শতছিন্ন শাড়ি আর ধুতি। একটা বাঁক নিতেই দেখতে পেল এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাপড়টা লুঙ্গির মতো করে পরে একেবারে বাঙালি কায়দায় হুকো টানছে। পাশে বসে আছে, তিন রমণী। একজন একটা ছেঁড়া শাড়ি সেলাই করছে, আর দুজন কুলোয় করে কি যেন ঝাড়ছে, চালও নয় গমও নয়, অন্য কিছু।

কাছে এসে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে পরিষ্কার বাংলায় সোমশংকরকে বসতে বললেন। ইতিমধ্যে ওই তিনজন মহিলা উঠে ঘরের ভেতরে চলে গেলেন। কোথায় বসবে - এই ভেবে যখন ইতঃস্তত করছে তখন একটি মেয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে একটা চ্যাটাই পেতে দিল।

—আমার মেয়ে সুমিত্রা।

মেয়েটি ফিক করে হেসে চলে গেল ঘরের ভেতর।

—কিশোরগুলি যখন বলল একবাবু, এখানে ঘোরাঘুরি করছেন তখন বুঝি নাই সে আপনিই বটে।

কথায় কথায় সোমশংকর জানতে পারল ওই তিন মহিলা রামবাবা, অর্থাৎ রামবাবুর স্ত্রী, একজন বিয়ে করা আর দুজন পিতৃবিয়োগের ফলে স্ত্রী হয়েছেন। ওঁরা আগে এত দরিদ্র ছিল না। অঢেল মাছ পাওয়া যেত। এখন আর পাওয়া যায় না। ছেলেরা মাছ ধরার কাজ ছেড়ে এখন ভ্রমণকারীদের সমুদ্রে নামতে সাহায্য করে টাকার বিনিময়ে। জেলে থেকে নুলিয়া। রামবাবুর এখনও মাছ ধরার নেশা যায়নি। সমুদ্রের ঢেউ আর রং দেখতে বুঝতে পারেন তার মেজাজ, আর বেড়িয়ে পড়েন।

ওদের পূর্বপুরুষ এসেছিল অন্ধ্র থেকে তাই এখনও কাপড়টা লুঙ্গির মতন করে পড়েন। পুরীতে যারা বেড়াতে আসে তাদের বেশিরভাগই বাঙালি। ছোটোবেলা থেকে বাংলা ভাষা শুনতে শুনতে ওরা বাংলাটা ভালোই বোঝেন শুধু নয়, বলতেও পারেন। এমন সময় আগের মেয়েটি এক কাপ চা দিয়ে গেল একটা থালায়। কাপটায় ফাটা দাগ। সোমশংকর কাপটা নিয়ে একটা চুমুক দিতেই বিস্বাদে ভরে গেল মুখটা, পেঁপে পাতার গন্ধ, কিন্তু বাইরে কোনো বিরক্তির ভাব প্রকাশ করল না এবং সেই বিস্বাদ চা সমস্তটাই খেয়ে ফেলল। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরগুলোকে দেখে কেমন একটা মায়া হল, ও পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে রামবাবুর হাতে তুলে দিল, ওদের জন্যে একটু মিষ্টি খাবার ব্যবস্থা করার জন্যে। রামবাবু প্রথমে টাকাটা নিতে চাইছিলেন না, অনেক করে বলার পর নিলেন।

সোমশংকর একবার হাত ঘড়িটা দেখে নিল, তারপর বলল—এখন আসি রামবাবু?

—বাবু একটা কথা, যদি পারেন দশেরার দিন একবার আসবেন, আমাদের এখানে একটা উৎসব হয়।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় কলকাতার কথা। সারা শহর আলোয় ঝলমল করছে। প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে মানুষের ভিড়, আর মাইকে মাইকে অবিশ্রান্ত গান, বড়ো অস্থির লাগে সোমশংকরের, তাই পুজোর সময় ও বেরিয়ে পড়ে, কখনও বিহার কখনও মধ্যপ্রদেশ, কখনও ওড়িশা।

—বাবু, কিছু বললেন না?

—আপনাদের উৎসব, আমি আসব না?

এর ঠিক দুদিন পরে প্রদীপ বলে ছেলেটি ওকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল।

—আপনার খুব সাহস, না?

—কেন বলোতো?